মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৩

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

৩০ শিক্ষার্থীকে সেরা পাঠ প্রতিক্রিয়া পুরস্কার প্রদান

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি এবং দেশবরেণ্য নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের স্মরণে ২৩ জুন ২০২৩ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত হয় আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। প্রথম বারের মতো আয়োজিত এই আয়োজনে তিনটি বিভাগে ১০জন করে মোট ৩০জন শিক্ষার্থীকে সেরা পাঠ প্রতিক্রিয়া পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারী ২৪৮ জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী পাঠাগার কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকসহ উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মফিদুল হক, সারা যাকের, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর ও আলী যাকের কন্যা শ্রিয়া সর্বজয়া। মঙ্গলদীপ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াসে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই গ্রন্থপাঠের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, 'আমরা আটজন ট্রাস্টি আজ থেকে সাতাশ বছর আগে সেগুনবাগিচার ভাড়া বাড়িতে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই যাত্রাপথে খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিনজন সহযোদ্ধা রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও আলী যাকের আমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের মেধা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে জাদুঘর ও তার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁরা দেশপ্রেমের দায়িত্ববোধ থেকে বহুমাতৃক কর্মযজ্ঞে শীর্ষ পর্যায়ে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মনে করে তাঁদের প্রত্যেককে নিজনিজ কর্মক্ষেত্র ও আগ্রহ বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট সৃজনশীল উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করে প্রতি বছর স্মরণানুষ্ঠান আয়োজন করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণে

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আলোকচিত্র প্রদর্শনী | রোহিঙ্গাদের চোখে জীবন (জিন্দেগী রোহিঙ্গার সুকর্তু)

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর, রোহিঙ্গাটোগ্রাফার ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে 'রোহিঙ্গাদের চোখে জীবন' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গত ২০ জুন ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী ১০ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত চলার কথা থাকলেও দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে ১৫ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত চলে।

'রোহিঙ্গাদের চোখে জীবন' শিরোনামের এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে রোহিঙ্গাটোগ্রাফার গ্রুপের উনিশজন রোহিঙ্গা শরণার্থীর ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত তোলা আলোকচিত্রের পঞ্চাশটি আলোকচিত্র এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা ১৯৭১ সালের শরণার্থীদের ১০টি আলোকচিত্র ঠাঁই পেয়েছে। সেই সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমে কয়েকটি আলোকচিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে। রোহিঙ্গাদের দুর্বিষহ শরণার্থী জীবনের সাথে ৫২ বছর আগে বাঙালিদের শরণার্থী জীবনের অভিন্ন মিল খুঁজে পাওয়া যায় এই প্রদর্শনীতে।

বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গা আলোকচিত্রীদের সামষ্টিক কর্ম ও কুশলতা এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছে। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বিকাশ, আত্মপ্রকাশ এবং এর উপস্থাপন এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য। আয়োজিত প্রদর্শনী রোহিঙ্গা যুবকদের সৃষ্টিশীল পরিসর যুগিয়েছে, যেখানে তারা কেবল প্রতিকূলতার শিকার হিসেবে পরিচিত না হয়ে তাদের সৃজনশীলতা, প্রতিভা এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

প্রদর্শনীটি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক এবং শরণার্থী শিবিরের প্রতিকূলতা মোকাবিলায় তাদের দৃঢ়তা অন্বেষণ করে। নিপীড়ন ও সহিংসতার

কারণে মাতৃভূমি ছেড়ে পালিয়ে এসে দ্রুতই শরণার্থী শিবিরের জীবনযাত্রার সাথে নিজেদেরে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে তাদের, সীমিত সম্পদ নিয়ে কঠোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। সব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও রোহিঙ্গারা লড়াকু, জীবন পুনর্গঠন এবং নিজেদের ও সন্তানদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রদর্শিত আলোকচিত্রগুলো রোহিঙ্গাদের

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইউএনএইচসিআর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ পাপেট শো

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর, রোহিঙ্গাটোগ্রাফার ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে 'রোহিঙ্গাদের চোখে জীবন' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতায়

গত ১০ জুলাই ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে শিশুদের জন্য একটি পাপোট শো আয়োজন করা হয়। লাইট অফ হোপ এর সহযোগিতায় এই পাপেট শো আয়োজিত হয়। ইউএনএইচসিআর প্রকাশিত বই 'আমার বন্ধু আমেনা'-কে ভিত্তি করে পাপেট শো-টি নির্মিত হয়। অনুষ্ঠানে শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং আগারগাঁও আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিশুদের গল্প পড়ে শুনিয়েছেন শিশুতোষ গল্পের বইয়ের লেখিকা তাহমিনা রহমান সাথী এবং লাইট অফ হোপের বই প্রকাশনা বিভাগ 'গুফি'র বিখ্যাত চরিত্র Bluetooth পাপেট শো পরিচালনা করেন শুভস্কর দাস শুভ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, ইউএনএইচসিআর-এর পক্ষ থেকে মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন এবং লাইট অফ হোপ এর পক্ষ থেকে মুকুল আলম অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। মূল অনুষ্ঠানে Bluetooth এবং গল্পকার মিলে 'আমার বন্ধু আমেনা' নামের চমৎকার গল্পের বইটি শিশুদের পড়ে শুনিয়েছেন। এরপর উপস্থিত সব শিশুরাই আয়োজকদের কাছ থেকে বইটির একটি কপি উপহার হিসেবে পায়। পাপোট -শো শেষে শিক্ষার্থীরা 'রোহিঙ্গাদের চোখে জীবন' প্রদর্শনী ঘুরে দেখে।

বইটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শিশু আমেনার সাথে বাংলাদেশী শিশু আলীর বন্ধুত্বের গল্পের মধ্য দিয়ে বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, সহমর্মিতা প্রদর্শন ইত্যাদি। পাপোট- শো-টির মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। ইউএনএইচসিআর এবং লাইট অফ হোপ ইতোমধ্যে ঢাকা ও কক্সবাজারে ২০টি স্কুলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করেছে। সেখানে ১০ হাজারের বেশি শিশুকে 'আমার বন্ধু আমেনা' গল্পটির পাপেট শো-এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তৈরি এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে প্রতিষ্ঠান দুটি। আগামী দুই মাস ধরে ঢাকার ১০টি স্কুলে এই ধরনের পাপোট-শো অনুষ্ঠিত হবে।

-আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জল্লাদখানা বধ্যভূমির ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

মহান মুক্তিযুদ্ধে নির্মম গণহত্যার স্মৃতিবিজড়িত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ ২১ জুন ২০২৩ ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর নকশায় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক পরিকল্পনা ও জল্লাদখানায় শহীদ পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতায় ২০০৭ সালের ২১ জুন স্মৃতিপীঠ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। যার মধ্যভাগে রয়েছে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী ও মনিরুজ্জামান-এর নকশায় তৈরীকৃত ম্যুরাল 'জীবন অবিনশ্বর'।

২০০৭ সালে ২৭ টি শহীদ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলেও পরবর্তীতে আরো ৪৩ জন শহীদের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে জল্লাদখানায় ৭০ জন শহীদের তালিকা ও শহীদ স্বজনের সাক্ষাৎকার সংরক্ষিত রয়েছে। যা নতুন প্রজন্মের নিকট গণহত্যার সত্যতা তুলে ধরতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে গত এক বছরে ৩১,৭৩৬ জন দর্শণার্থী পরিদর্শন করেছেন। এর মধ্যে শিশু ১২,৪৪৮ জন, নারী ৭,০০৫ জন, পুরুষ ১২,২৬৯ জন এবং বিদেশী দর্শণার্থী ১৪ জন। বিগত ষোল বছরে ৮,৭৬,১৬৮ জন দর্শণার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করেছেন।

জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে শহীদ পরিবারের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। নতুন প্রজন্মকে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে একাত্তরে জল্লাদখানাসহ বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বধ্যভূমির নির্মম গণহত্যার ইতিহাসকে তুলে ধরা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। মানবাধিকার ও সম্প্রীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জল্লাদখানায় নিহত শহীদ পরিবারের সাথে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারমূলক এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । শহীদ স্বজনের সামনে বসে যুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি সর্ম্পকে জেনে নতুন প্রজন্মের মনে বিশেষ রেখাপাত ঘটায়। সেই সাথে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সাল থেকে বিগত ১৬ বছরে এই কর্মসূচিতে ২৮২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২২,৩২৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। স্বাগত বক্তব্যের পর জল্লাদখানা বধ্যভূমির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার মোকলেছুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন শহীদ খন্দকার আবু তালেব-এর পুত্র খন্দকার আবুল আহসান, শহীদ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরীর কন্যা নাসরিন আক্তার চৌধুরী, শহীদ আব্দুল হাকিম-এর পুত্র আব্দুল হামিদ, শহীদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান ও শহীদ কাশাবাদ্দৌজার কন্যা শাহিনুদ্দৌজা শেলী। উপস্থিত ছিলেন শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

শহীদ সন্তানদের স্মৃতিচারণের পর শহীদ পরিবারের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম নিয়ে গঠিত 'বধ্যভূমির সন্তানদল'-এর বিশেষ পরিবেশনা গীতি-নৃত্য-কাব্য-আলেখ্যানুষ্ঠান 'সম্প্রীতির বাংলা আমার' পরিবেশিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুকুল ফৌজ-এর ছোট্ট নৃত্যশিল্পী বন্ধুরা পল্লীগীতি গানে

মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে। মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর আবৃত্তি, যুব বান্ধব কেন্দ্র, বাপসা দলীয় নৃত্য, সংগীত সমাজ কল্যানপুরের প্রবীণ শিল্পীবৃন্দ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান এবং পঞ্চায়েত শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র গণজাগরণমূলক গান পরিবেশন করে। অপেরা নাটকের দলের 'পাখির ভবিষ্যৎ' নামক শিক্ষামূলক নাটক পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন।

প্রমিলা বিশ্বাস
তত্ত্বাবধায়ক, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

প্রাক-আইএজিএস সম্মেলন উপস্থাপনা

বাংলাদেশী তরুণ গবেষকদের দৃষ্টিতে ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিবন্ধকতা

গত ৮ জুলাই সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত হয় আইএজিএস সম্মেলনে প্রদত্ত বাংলাদেশী তরুণ গবেষকদের দৃষ্টিতে ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জগুলোর উপর প্রাক-উপস্থাপনা। উল্লেখ্য যে সিএসজিজে-এর তিনজন তরুণ গবেষক স্পেনের বার্সেলোনায় ১০-১৪ জুলাই ২০২৩২-এ অনুষ্ঠিত হওয়া IAGS ১৬তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপরে উল্লিখিত থিম নিয়ে উপস্থাপনার প্রস্তুতি হিসেবে মেহজাবিন নাজরানা, তাবাসসুম নীগার ঐশী এবং তাবাসসুম ইসলাম তামান্না সম্মেলনে প্রদত্ত উপস্থাপনাগুলো উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মেহজাবিন নাজরানা তার পেপার উপস্থাপন করেন, উপস্থাপনার বিষয় ছিলো Media Incitement to Genocide। তিনি বলেন, গণহত্যার প্ররোচনা এমন একটি বিষয় যা হলোকাস্ট গণহত্যার সময় থেকে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। মিডিয়া ঘৃণাত্মক বক্তব্যকে ফলাওভাবে প্রচার করে পরোক্ষভাবে সহিংসতা সৃষ্টি ও গণহত্যার প্ররোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তাবাসসুম নীগার ঐশী তার উপস্থাপনায় বলেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার হচ্ছে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ। একবিংশ শতাব্দীতেও, সামাজিকভাবে ঘৃণামূলক বক্তব্যের ব্যাপক বিস্তারের কারণে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন, হামলা, সহিংস আক্রমণ এবং চরমপন্থা বৃদ্ধি পায়, যার অন্যতম বাহক সোশাল মিডিয়া। প্রধানত ঘৃণাত্মক বক্তৃতা যখন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীর দিকে পরিচালিত হয়, তখন এটি একটি গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করে সম্ভাব্য ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সহিংসতা উসকে দিতে পারে, তাই ঘৃণাত্মক বক্তব্যের সমসাময়িক প্রকৃতি এবং কারণগুলো বোঝা প্রয়োজন। উপস্থাপনায় তাবাসসুম নীগার ঐশীর বিষয় ছিলো Contemporary Hate Speech Campaign against the Religious Minorities in Bangladesh।

সবশেষে উপস্থাপনায় আসেন তরুণ গবেষক তাবাসসুম ইসলাম তামান্না। তার বিষয় ছিলো 'রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রচারের জন্য মেটার (ফেসবুক) বিরুদ্ধে মামলা'। তিনি তার উপস্থাপনায় বলেন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, মেটা ফেসবুকের ভূমিকা রোহিঙ্গাদের প্রতিপালনে ক্ষতিপূরণের একটি নতুন দাবি। মিয়ানমারে জাতিগত নৃশংসতার মামলা হয়েছে। সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, গণহত্যায় মেটার নিযুক্তি নিছক একটি প্যাসিভ এবং নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম যা একটি সংকটে পর্যাপ্তভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এবং মেটা দ্বারা এই মামলায় নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি হয়। প্রাক-উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে চেয়ারপারসন ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সিএসজিজে-এর পরিচালক মফিদুল হক। তার মতামত ও প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জাহিদ-উল ইসলাম
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তাদের ১৭ জুন ২০২৩, এপিএ বিষয়ক দক্ষতা অর্জন শীর্ষক অর্ধদিবসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে জাদুঘরের ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উপসচিব (পরিকল্পনা) আমজাদ হোসেন এবং রিপোর্ট লেখার কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রকাশনা বিভাগের ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার। এছাড়া, এপিএএমএস সফ্টওয়ারে তথ্য আপলোডের বিষয়টিও আলোচিত হয়।

প্রশিক্ষক আমজাদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেছে, যা বার্ষিক পারফরম্যান্স এগ্রিমেন্ট (Annual Performance Agreement-APA) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত: সরকারি কর্মকর্তাদের সেবার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ১৯৯৭ সালে Public Administration Reform Commission (PARC) গঠন করা হয়। উপরন্তু, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র (National Integrity Strategy-NIS) প্রস্তুত করা হয়। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার Annual Performance Agreement (APA) নামে Government Performance Management System (GPMS) মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রবর্তন করেছে। APA বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১৫-১৬ সালে এবং মাঠ পর্যায়ে ২০১৬-১৭ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, APA বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো সরকারি অফিসসমূহে ফলাফলমুখী (Result Oriented) কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা এবং সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। সর্বোপরি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা। APA নথি তৈরির জন্য প্রতিটি সরকারি সংস্থাকে তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective- SO) নির্বাচন/নির্ধারণ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ অর্জনের জন্য কৌশলগত উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য দুই প্রকার: (১) নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য যা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব স্ব অফিস প্রনয়ণ করে থাকে এবং (২) বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Mandatory Strategic Objective-MSO) যা সুশাসন নিশ্চিতকরণ, সেবার মান উন্নয়ন, বিতরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারণ করেছে। তাছাড়া, APA দু'টি সরকারি অফিস (উচ্চতর অফিস এবং এর অধীনস্থ কার্যালয়) এর মধ্যকার কার্যক্রম বোঝার জন্য কর্ম প্রক্রিয়া থেকে ফলাফলমুখী কার্যকলাপগুলোতে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করা। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যথাযথভাবে নিশ্চিত করাও APA-এর লক্ষ্য। সম্পদের ব্যবহার এবং সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে যা একটি সরকারি অফিস আর্থিক বছরে অর্জনের প্রত্যাশা করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতি বছর, সমস্ত অফিসের জন্য একটি APA নির্দেশিকা তৈরি করে।

APA নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সময় ভিত্তিক কার্যক্রম। ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন ধাপ মোট ৫টি- যথা: ১. পরমোৎকৃষ্ট (Excellent), ২. খুব ভালো (Very good), ৩. ভালো (Good), ৪. সন্তোষজনক (Fair/Satisfactory) ও ৫. সন্তোষজনক নয়।

রিপোর্ট লেখার কলাকৌশল বিষয়ে সত্যজিৎ রায় মজুমদার বলেন, অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স বা যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লিখিত মাধ্যমে অফিসের কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ, উপস্থাপন ইত্যাদির জন্য প্রতিবেদন তৈরির নিয়ম অনুসরণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে রিপোর্ট লেখার কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার বলেন, প্রতিবেদন হচ্ছে সংঘঠিত তথ্যের বিবরণী। প্রতিবেদনে ঘটনাটি কি, কখন, কোথায় সংঘঠিত হয়েছে এবং তা কে বা কারা সংঘঠিত করেছে তা উল্লেখ থাকতে হয়। প্রসঙ্গত: রিপোর্ট বা প্রতিবেদন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন- ১. সংবাদ প্রতিবেদন, ২. প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, ৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, ৪. দাপ্তরিক প্রতিবেদন, ৫. তদন্ত প্রতিবেদন, ৬. গবেষণামূলক প্রতিবেদন, ৭. প্রস্তাবনা প্রতিবেদন, ৮. ঘোষণা প্রতিবেদন, ৯. নিয়মিত প্রতিবেদন, ১০. বিশেষ প্রতিবেদন, ১১. রাজনৈতিক প্রতিবেদন এবং ১২. সাংস্কৃতিক প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের ধরণ অনুযায়ী প্রতিবেদন লেখার কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নির্ভুল তথ্য, তথ্যের পরিপূর্ণতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা সবধরণের প্রতিবেদনের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। প্রতিবেদন লেখার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, গবেষণামূলক তথ্য, তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও উপসংহার/মতামত/সুপারিশ থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

এস এম মোহসীন হোসেন

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

১ম পৃষ্ঠার পর

ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্ট-এর সাথে স্মারক বক্তৃতা এবং জিয়াউদ্দিন তারেক আলী স্মরণে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস্ অব কনসিয়েন্স-এর সাথে কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে তরুণদের ফেলোশিপ প্রবর্তন করেছি। আমরা শিক্ষার্থীদের বই পাঠে উৎসাহিত ও পাঠাগার আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে আলী যাকেরকে স্মরণ করছি। মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শের রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক তরুণ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন লালন করেছেন। আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে নানা ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজগতে তার প্রভাবও পড়েছে, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীতে রূপান্তর করা সহজ নয়। নিজের ও পার্শ্ববর্তী জগৎকে উপলব্ধি, বিশ্লেষণ ও চিন্তাধারা প্রসারিত করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অন্যান্য সৃজনশীল বই পাঠের বিকল্প নেই। নীলক্ষেতে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এজন্য একান্তভাবে প্রয়োজন পাঠাগারের সমৃদ্ধি, পৃষ্ঠপোষকতা ও বিস্তৃতি। আলী যাকের স্মরণের এই উদ্যোগে যারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।'

এরপর বক্তব্য প্রদান করেন আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সমন্বয়ক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ। তিনি বলেন, উপস্থিত ৪২টি পাঠাগারের পাঠক ও সংগঠকদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক বিশাল অনুপ্রেরণা। কোভিড চলাকালিন ২০২০ সালে আমরা বঙ্গবন্ধুর তিনটি বই নিয়ে পাঠ কার্যক্রম শুরু করি। এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এই পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়। আলী যাকের স্মরণে গৃহীত এই কার্যক্রম নিয়ে আমরা যাতে সারাদেশে ছড়িয়ে যেতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

এরপর স্কুল পর্যায়ের পুরস্কার প্রদান করা হয় সেরা দশ পাঠ প্রতিক্রিয়া লেখককে। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন, কামাল স্মৃতি পাঠগারের নিহারা চক্রবর্তী, শহীদ বুদ্ধিজীবী পাঠাগারের সুমনা আফসিন, বর্ণ গ্রন্থাগারের সাদিক মাহমুদ, বাকী স্মৃতি পাঠাগারের মোহাম্মদ ফাহিম, গ্রন্থ বিতানের উমায়রা জান্নাত মাহিয়া, দনিয়া পাঠাগারের সুলতানা শারমিন সামিয়া, সেলিম আল দীন পাঠাগারের জান্নাতুল ফেরদৌস, মতি মাস্টার স্মৃতি পাঠাগারের মেহনাজ আফরিন খান মিথিলা, শহীদ বুদ্ধিজীবী পাঠাগারের সায়মা জান্নাত অনিকা এবং দনিয়া পাঠাগারের আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রর পরিচালক মিনার মনসুর বলেন, যার নামে আজকের এই আয়োজন তিনি একজন আলোর যোদ্ধা ছিলেন। আমার সামনে যারা বসে আছেন আমি নিশ্চিত তারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে আলোকিত করবেন। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র দেশের বেসরকারি পাঠাগার নিয়ে কাজ করছে। ১৫০টি পাঠাগার নিয়ে গবেষণা করে আমরা দেখেছি সেখানে পাঠক নেই। পরে আমরা একটা মডেল দাঁড় করাতে পেরেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত এই কার্যক্রম জারি রাখুন। এতে করে আমরা নতুন নতুন পাঠক পাবো। আমরা প্রতিযোগিতা করতে চাই না। আমরা নতুন পাঠককে উৎসাহিত করতে চাই। বাচ্চারা বই পড়তে চায় না, এই ধারনা সত্য নয়। আজকের এই কার্যক্রম প্রমাণ করে পাঠকরা বই পড়ে। এখানে যারা পাঠ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে অসাধারণ তাদের পর্যবেক্ষণ।

এরপর বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি বলেন, জাদুঘরের এই মিলনায়তন প্রাণের স্ফূর্তিতে ভরপুর হয়ে গেছে। এ আয়োজনের মূল কারিগরদের অভিনন্দন জানাই। যে ৫০টি পাঠাগার এখানে যুক্ত হয়েছেন, যে ৪২ পাঠাগার আমাদের উদ্যোগে সাড়া দিয়েছিল এবং বিশেষ করে ঢাকার ১০টির অধিক পাঠাগার স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে তাদেরকে আমরা কেবল ধন্যবাদ জানাতে চাই না। পাঠাগারগুলো থেকে সংগৃহীত এতো এতো পাঠ প্রতিক্রিয়া পড়ে শর্টলিস্ট করতে যে নির্বাচক মণ্ডলী ভূমিকা রেখেছিল, খুব সহজ ছিল না তাদের কাজ। 'বেসরকারি পাঠাগার' এই কথাটা এখানে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও একটি বেসরকারি জাদুঘর। এই বেসরকারি কথাটা আমার খুব পছন্দ হয় না। আসলে এটা হচ্ছে সামাজিক শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠান যারা গড়ে তোলেন, তারা অন্তরের তাগিদেই গড়েন। এই পাঠাগারগুলো সামাজিক শক্তিতে সেই কাজটিই করেছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৩ সালে লেখা জহির রায়হানের উন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' তিনি শেষ করেছিলেন 'আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো' এমন একটি লাইন দিয়ে। আগামী বছর আমার মনে হয় এই উদ্যোগকে আমরা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ করতে পারবো। আমরা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে সামনের দিনে পাশে চাইবো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সামর্থ সীমিত কিন্তু শক্তিটা বিশাল। এই শক্তি সমাজের শক্তি। তার সঙ্গে অবশ্যই সরকারে সহযোগিতা ও অঙ্গীকার সেখানে যুক্ত হবে। শেষে বলবো, যে পাঠক-পাঠিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এই পাঠ কার্যক্রমে অংশ নিলো তারা প্রত্যেকে আজ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্তাবহ হয়ে উঠবেন।

এরপর কলেজ পর্যায়ের পুরস্কার প্রদান করা হয় সেরা দশ পাঠ প্রতিক্রিয়া লেখককে। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন, মুকুল ফৌজ পাঠাগারের সুরাইয়া আক্তার জ্যোতি, রুদ্রনীল দেবনাথ তুর্য, দনিয়া পাঠাগারের রাফসান জানি, অনির্বান পাঠাগারের জান্নাতুল মাওয়া তামান্না, মাইশা বিনতে কালাম, উত্তরা পাবলিক লাইবেরির শ্রাবনী জামান তুর্ণা, জারিফ তাহমিদ জোয়ার্দার, কামাল স্মৃতি পাঠাগারের তানজিলা আক্তার দোলা, মতি মাস্টার স্মৃতি পাঠাগারের তাসনিম জেরিন তিথি ও সৃষ্টি পাঠোদ্যানের আদিয়া সিদ্দিকা মিথিলা।

আলী যাকের কন্যা শ্রিয়া সর্বজয়া তার বক্তব্যে বলেন, আমার খুবই ভালো লাগছে মিলনায়তন জুড়ে এতো এতো সুন্দর মুখ দেখতে পেয়ে। যখনই আমার বয়সী কারো সাথে দেখা হয়, তাদের জন্য একটা মধুর স্মৃতি হচ্ছে বাবা যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে বিভিন্ন আউটরিচ কর্মসূচিতে স্কুলে গিয়েছেন, তখন বাবাকে ওরা দেখেছে এবং আমাকে সেটা ওরা আনন্দের সাথে বলে, 'স্কুল জীবনে তোমার বাবা আমাদের স্কুলে গিয়েছিলেন।' বাবা এসব কর্মসূচি খুব উপভোগ করতেন, আর তারাও বাবাকে এতো বছর পরেও মনে রেখেছে। আজকে যদি বাবা থাকতেন অনেক খুশি হতেন। এই অস্থির সময়ে এতো সব ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকের যুগেও আপনারা বই পড়ছেন এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার। শুধু পড়ছেনই না, আপনারা এতো ভালো লিখেছেন যে আপনাদের নিয়ে আমরা সবাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এটা অনেক বড়ো একটা বিষয়। কারণ বই একটা নতুন পৃথিবী দেখাতে পারে। সৃজনশীল বই পড়ার এই অভ্যাসটা আপনারা ধরে রাখবেন। আমিও আজকের অনুষ্ঠানের পর বাসায় গিয়ে একটা নতুন বই পড়বো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।

আলী যাকের-এর সহধর্মিনী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের তার বক্তব্যে বলেন, এই স্ক্রিনের যুগে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মলিন হয়ে যাচ্ছে। বই পড়ার অভ্যাস আমাদেরকে স্ক্রিনের বাইরে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে। আমরা আশা করবো পড়ার বইয়ের পাশাপাশি এইসব সৃজনশীল বই পড়ার অভ্যাস তোমরা ধরে রাখবে। মুখস্ত বিদ্যার দিন শেষ। কল্পনা শক্তি ও সৃজনশীল শক্তি বাড়াতে হবে। আগামীতে আমাদের এই বই পড়ার কর্মসূচি আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা করি।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সেরা দশ পাঠ প্রতিক্রিয়ার লেখককে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন, শিল্পবৃত্ত পাঠাগারের মারজানা তাসনিম মুনা, আয়েশা সিদ্দিকা মনি, গ্রন্থ বিতানের সনিয়া খানম, শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগারের মাহসাফ আল রহমান, কামাল স্মৃতি পাঠাগারের ফারহাস ফৌজিয়া অতসী, মতি মাস্টার স্মৃতি পাঠাগারের প্রীতি হোসেন, সীমান্ত পঠিাগারের মাহিমা রহমান, জাহানারা আক্তার, দনিয়া পাঠাগারের সানজীদা ইসলাম ও অনির্বাণ পাঠাগারের বুশরা বিনতে কালাম।

সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি। তিনি বলেন, আমরা যখন জাদুঘরটা শুরু করি তখন কিন্তু আমাদের মাথায় অমরত্বের চিন্তা ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম সকলের সহযোগিতায় একটা সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। সেই দিক থেকে এটা বাংলাদেশের মানুষের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। আলী যাকেরের সাথে আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সম্পর্ক। আমরা এক সঙ্গে নাটক করেছি, একসাথে কর্মজীবন কাটিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই তিনটি বিষয়ে তিনি কোনো দিন আপোষ করেননি। বাংলাদেশে টিকেটের বিনিময়ে নাটক দেখার এই চর্চা তিনি প্রবর্তন করেছেন। আমি যখন সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলাম একদিন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে গেলাম। গিয়ে দেখি প্রচুর পাঠক বসার জায়গা নেই। তবে কাছে গিয়ে দেখলাম তারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার পড়া পড়ছে। কিন্তু লাইব্রেরিতে বসে তো লাইব্রেরির বই পড়ার কথা ছিল। কয়েকদিন আগে আমার বাসায় একজন লোক আসলেন তার ফাইভে পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে। সেই ছেলেটির বিষন্ন মুখ ভুলতে পারছিনা। পড়াশোনার চাপে অতিষ্ঠ। বাচ্চাদের মস্তিষ্ক শুকিয়ে যাচ্ছে। যতীন সরকার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি যেমন রোধ করা প্রয়োজন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিস্মৃতি রোধ করা প্রয়োজন। এই বিস্মৃতি রোধ করতে পড়ার কোন বিকল্প নাই। আমি আপনাদের বলবো আপনারা পড়ুন।

এখানে উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২০ অক্টোবর দনিয়া পাঠাগারের সভাপতি মোহাম্মদ শাহনেওয়াজকে সমন্বয়ক করে ঢাকা মহানগরের কামাল স্মৃতি পাঠাগার, মুকুল ফৌজ পাঠাগার, সীমান্ত পাঠাগার, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগার, শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার, শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগার, অনির্বাণ পাঠাগার, উত্তরা পাঠাগার এবং সুলপিনা আদর্শ পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ সংস্থাকে এ উদ্যোগের সাথে সামিল করা হয়। এই ১০টি পাঠাগারকে ঢাকার মধ্যে ২টি এবং ঢাকার বাইরের ২টি করে পাঠাগারকে যুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হলে ১৯ নভেম্বের ঢাকা ও পাশ্ববর্তী মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, নরসিংদি, ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৫০টি পাঠাগারকে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ-এর জন্য বই প্রদান করা হয়। এ সকল পাঠাগার তাদের স্কুল পর্যায়ের সদস্যদের ড. জাফর ইকবাল রচিত মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস 'আমার বন্ধু রাশেদ', কলেজ পর্যায়ের সদস্যদের আলী যাকের রচিত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'সেই অরুণোদয় থেকে' এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সদস্যদের হাসান আজিজুল হক রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা' সরবরাহ করে।

এই উদ্যোগে প্রাথমিক বাচাই পর্বে বিচারক হিসেবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজ করেছেন– সমকালের আবু সালেহ রনি, জনকণ্ঠের মোরসালীন মিজান, ভোরের কাগজের ঝর্ণা মনি এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক মোহাম্মদ মহসিন।

শরীফ রেজা মাহমুদ

আলী যাকের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

স্বাগত ভাষণ : ডা. সারওয়ার আলী

সমবেত বিভিন্ন পাঠাগারের কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, তথ্য মাধ্যমের বন্ধুরা, সমবেত সুধিজন,

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও কর্মীদের পক্ষ থেকে আজকের আলী যাকের স্মরণ আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাই।

আমরা আটজন ট্রাস্টি আজ থকে ২৭ বছর আগে সেগুনবাগিচার স্বল্প পরিসরের ভাড়া বাড়িতে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সে যাত্রা পথে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিন জন সহযোদ্ধা রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী ও আলী যাকের আমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাদের মেধা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে জাদুঘর ও তার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাঁরা দেশপ্রেমিক দায়িত্ববোধ থেকে বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞে শীর্ষ পর্যায়ে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিরা মনে করে যে, তাদের প্রতিজনকে তার কর্মক্ষেত্র ও আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট সৃজনশীল উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করে প্রতি বছর স্মরণানুষ্ঠান আয়োজন করা প্রয়োজন। এ ধরনের বার্ষিক আয়োজনের বিস্তৃতি তাঁদের স্মরণীয় করে রাখবে। ইতিমধ্যে আমরা স্থপতি রবিউল হুসাইনের স্মরণে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি)-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে স্মারক বক্তৃতা ও তারেক আলীর স্মরণে

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

The Tariq Ali Fundraiser for the Liberation War Museum

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি। একাত্তরে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথে যুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের এক শরণার্থী শিবির থেকে আরেক শিবিরে। সেই ইতিহাস সবার জানা 'মুক্তির গান' প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে। তবে সবাই জানেন না মুক্তিযুদ্ধে তার এই সম্পৃক্তি আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, তরুণ ছাত্র হিসেবে যখন পাকিস্তানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য যান তখনই তার কাছে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈষম্যমূলক আচরণের স্বরূপ উন্মোচিত হয়, পাকিস্তানি শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অন্তরে লালন করতেন বাঙলার সংস্কৃতি। পরবর্তী জীবনে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজের সুত্রে দীর্ঘ প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন কিন্তু স্থায়ী হননি। ফিরে এসেছেন নিজ ভূমিতে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যখন বিস্মৃতি ও বিকৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে তখন সমমনা সাতজনের সাথে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা জুড়ে ছিলো এই জাদুঘর। করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনি অনন্তলোকে চলে গেলেন। রয়ে গেছে তার প্রাণের প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করলে এগিয়ে আসে তাঁর পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের সদস্যরা। গত ৮ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে তারা আয়োজন করে The Tariq Ali Fundraiser for the Liberation War Museum-এর সূচনা অনুষ্ঠান। এই উদ্যোগের মাধ্যমে জিয়াউদ্দিন তারিক আলির পরিবারের পক্ষ থেকে জাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করা হবে তহবিল। আয়োজনে তারিক আলীর পুত্র মিশা আলী এবং কন্যা শ্রাবন্তী আলী বলেন, তারা তাদের বাবার কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদের বাবার প্রিয় প্রতিষ্ঠান আরো সমৃদ্ধ হোক, এগিয়ে যাক এটিই তাদের কামনা। শ্রাবন্তী আলী তার বাবার উদ্দেশে পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সংগীত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তরুণ প্রজন্ম নানাভাবে যুক্ত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে। তিনি 'ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ' নামক প্রতিষ্ঠানের নেয়া উদ্যোগ 'রান ফর ফ্রিডম'-এর উল্লেখ করেন। এই ম্যারাথনটিও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে আয়োজিত হচ্ছে। ম্যারাথনের আয়োজক ইমরান ফাহাদ তাদের আয়োজনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পরে তারিক আলী পরিবারের পক্ষ থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তহবিলে প্রদান করার মাধ্যমে তহবিল উদ্যোগের সূচনা হয়।

আলী যাকের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

স্বাগত ভাষণ : ডা. সারওয়ার আলী

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) -এর সহযোগিতায় একই সময়কালে সংঘটিত কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়ার বিষয়ে তরুণদের fellowship-এর আয়োজন করেছি।

সুধিজন,

আমরা আজ বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বই পাঠে উৎসাহিত ও সে জন্য পাঠাগার আন্দোলনকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে আলী যাকেরকে স্মরণ করছি। এই আয়োজনের সহউদ্যোক্তা তাঁর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান মঙ্গলদীপ।

মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শের রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক তরুণ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন লালন করেছেন। তার পর্যায়ের অভিনেতা ও নির্দেশক খুব কম সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তিনি কেবল দেশ-বিদেশের নাট্যকলা সম্পর্কিত পুস্তকে নিমগ্ন থাকেননি, চিন্তাধারাকে প্রসারিত করার জন্য বিশেষ করে শিল্পকলা ও দেশ বিদেশের নানা ধারার ক্লাসিক পাঠে আগ্রহী ছিলেন।

শিক্ষা কার্যক্রমে assignment ভিত্তিক নানা ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, ছাত্রছাত্রীর মনোজগতে তার প্রভাবও পড়বে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীতে রূপান্তর সহজ নয়।

নিজের ও পার্শ্ববর্তী জগৎকে উপলব্ধি, বিশ্লেষণ ও চিন্তাধারা প্রসারিত করার জন্য আমাদের প্রজন্মের মতো সৃজনশীল বইয়ের বিকল্প নেই। নীলক্ষেতে তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এজন্য একান্ত প্রয়োজন পাঠাগারের সমৃদ্ধি, পৃষ্ঠপোষকতা ও বিস্তৃতি। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে ভাবধারার আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছি, তার জন্য এটি একান্ত প্রয়োজন। এটি জাতীয় দায়িত্ব। এ দায় পূরণে সারাদেশে যারা সকল অসহযোগিতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাঠাগার গড়ে তুলেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা,

পরিশেষে, তোমাদের জন্য আলী যাকেরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করে বক্তব্যের সমাপ্তি টানবো। মাধ্যমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরা তার আত্মজীবনীমূলক বই 'সেই অরুণোদয়ের পথে' পাঠ করেছো। তোমরা লক্ষ করেছো, তার পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত গভীর ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সে বাবা, মা ও বড় বোন, যার উপর সে নির্ভরশীল ছিল, তাদের হারিয়ে দিশেহারা হয়েছে। কিন্তু হাল ছাড়েনি। কর্মজীবনে নাটক, আলোকচিত্রী কিংবা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, ... যে কাজে হাত দিয়েছে এই স্বনির্ভর মানুষটি সোনালি ফসল তুলেছে। এটি সম্ভব হয়েছে তার নিষ্ঠা, পরিশ্রম, সহকর্মীদের সাথে সহমর্মিতা ও আত্মবিশ্বাসের কারণে। দ্বিতীয়ত: সে রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি সচেতন মানুষ; তবে মাঠকর্মী নয়। কিন্তু দেশ ও সমাজের যখন defining moment আসে, তখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে তার ন্যূনতম দ্বিধা হয়নি। সে জীবন থেকে পাঠ নিয়েছে, জীবন নিয়ে কোন অতৃপ্তি বহন করেনি, জীবনকে উদযাপন করেছে। যত প্রতিকূলতা আসুক, আলী যাকের স্মরণে আসুন জীবনকে উদ্‌যাপন করি।

ধন্যবাদ। জয় বাংলা!

মু | ক্তি | যো | দ্ধা | র || ভা | ষ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসান মাসুদ

আমার জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৫২ পুরান ঢাকার ৩৭ নং হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন বংশালে। আমার বাবা মাওলানা কবিরউদ্দীন রহমানী। তিনি বংশাল জামে মসজিদের ইমাম ও আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। আমার মা ফয়জুন্নেসা খাতুন। আমরা ছিলাম দশ ভাই-বোন। ১৯৬৭ সালে আরমানীটোলা স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং নটরডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ১৯৬৯ সালে। প্রথমে আমি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হই। মুক্তিযুদ্ধের পর আমি আবার ঢাকায় বুয়েটে ভর্তি হই। মাঝে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকি। ২৫ মার্চের গণহত্যার পর আমরা বুঝে যাই যুদ্ধে যেতে হবে। যোগাযোগ শুরু করি। মে মাসের ২য় সপ্তাহ নাগাদ আমি আগরতলা যাই। আমরা ছিলাম মেলাঘরের ২য় ব্যাচ। গেরিলা ওয়ারফেয়ারের বেসিক রুল হিট এন্ড রান। ঢাকায় আমাদের পাঠানো হলো অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে। কারণ পাকিস্তান সরকার সারা পৃথিবীকে দেখাতে চেয়েছিল এখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আমাদের অস্ত্রের সাপ্লাই শুরুতে খুব লিমিটেড ছিল। আমাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা যদি যুদ্ধ করতে চাও পাকবাহিনীর অস্ত্র ছিনিয়ে নাও। দেশে আসার সময় আমাদের টিম লিডারদের কাছে একটি স্টেনগান ও আমাদের প্রত্যেককে একটি বেয়নেট দেয়া হয়েছিল। এই ছিল সর্বসাকুল্যে যুদ্ধের সম্বল। ৮/৯ জনের এককেটা গ্রুপ। আমরা এক একটা গ্রুপ এক এক এলাকায় অবস্থান নিলাম। কৃষি জিয়া আমাদের গ্রুপ লিডার। আমরা ছিলাম বংশাল, মোগোলটুলি, চকবাজার, হাজারীবাগ। তখন বোধ হয় জুলাই মাস আমাদের কাছে নির্দেশনা এলো পাওয়ার গ্রিডে হামলা করার। ঢাকা ব্ল্যাক আউট করতে হবে। সব গ্রুপ সফল হলো। আমাদের দায়িত্ব ছিল গুলশানে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা ব্যর্থ হই। এরপর আমরা সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে হামলা করার জন্য ডেমরার আশপাশে অবস্থান গ্রহণ করি। সম্ভবত সারুলিয়া নামক জায়গায়। বিরাট অপারেশন হবে। অনেক অস্ত্র এলো এবার। মূল আর্মি এতে অংশ নেবে। আমরা বেসিক্যালি ফুট সোলজার। বসে আছি নির্দেশনার অপেক্ষায়। এরমধ্যে বদি, রুমি, জুয়েল, জিয়া আমরা সবাই একটা কালভার্ট ধ্বংস করার পরিকল্পনা করলাম। সেই যুদ্ধে জুয়েলের হাতে গুলি লাগলো। আবার আমরা ব্যর্থ হলাম। আগস্ট মাসে আমরা ঢাকায় ফিরি। আমরা কেউ জানি না কে কোথায় থাকে। এরমধ্যে কিছু একটা ঘটলো। কাজীর বাড়ি ও আলমের বাড়িসহ আরও অনেকের বাড়ি রেইড হয়েছে। আমরা জানি না ২৯/৩০ আগস্ট অ্যাকশনটা হয়ে যায়। আমাদের অস্ত্র ছিল হাজারীবাগে। আমাদের গ্রুপ লিডার জিয়া ফিরলো না। বাধ্য হয়ে দায়িত্ব নিতে হলো আমাকে। আজিজ ভাইয়ের গ্রুপের সাথে আমাদের গ্রুপের অস্ত্র আদান প্রদান করলাম। বাদল নামে একটা ছেলে, রাশেদ খান মেননের ছোট ভাই, ওর কাছে হাতিরপুলে কিছু অস্ত্র ছিল। আমরা সেগুলো সংগ্রহ করলাম। আজিজ ভাই ডেমরা থেকে আরো ভিতরে ছিল। আমরা অস্ত্র নিয়ে সেখানে গেলাম। শামসু হলো আমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। সামসুর দুই বন্ধু হাজারীবাগ থাকতো– মোস্তফা ও ইলিয়াস, তারা তাবলিগ করতো। ওদের কাছে আমাদের অস্ত্র নৌকাতে এনে রেখে ঢাকায় ঢুকলাম। এবার চাইছি আমরা কিছু একটা সফলতা করে দেখাই। আমাদের টাকা দরকার। আমরা ঠিক করলাম টাকা সংগ্রহ করবো। ঠিক করলাম পাকিস্তনি কোন ব্যাংক ডাকাতি করবো। আমার বয়স ১৯। জীবনে কোন দিন ব্যাংকে যাইনি। লোক রিক্রুট করতে হবে। কিন্তু কাকে নিবো কাকে নিবো না। চার দিকে রাজাকার গিজগিজ করছে। অনেকে জয়েন করতে চায়। কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবো। পরে নবাবপুর রোডের মাঝ বয়সী একজন, করিম (৪০) মেডিকেশনের সাপ্লাইয়ের কাজ করে, তাকে একটা কাজ দিলাম। ক্লোরোফর্ম এনে দিতে হবে। এনেও দিল। এটা যে ক্লোরোফর্ম কি করে বুঝবো। করিম ভাইয়ের ওপর পরীক্ষা করলাম। হাটখোলা রোডের হাবিব ব্যাংক ডাকাতির সিদ্ধান্ত হলো। করিম ভাইকে পাঠালাম রেকি করতে। দুই জন পাঞ্জাবি সিকিউরিটি গার্ড আছে। একদিন দুপুর একটায় ব্যাংক লুটের পরিকল্পনা করা হলো। কিন্তু একটা গাড়ি লাগবে। গাড়ি হাইজ্যাক করতে হবে। করিম ভাইয়ের দায়িত্ব রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি সে পেপার পড়ে তবে সেভ টু গো, না পড়লে সেভ না। আমার দায়িত্ব গাড়ি হাইজ্যাক করা। হাতিরপুল বাজার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা। তারপর ব্যাংক আক্রমণ করা। গাড়ি যে হাইজ্যাক করবো আমি তো চালাতে পারি না। ড্রাইভার কই পাবো গোপনীয়তা রক্ষা করে। তখন আমি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র। গ্রিন রোডের খালেদ আমার ক্লাসমেট। খালেদের কাজিন আজাদ হাফিজকে (কণ্ঠ শিল্পী ডালিয়ার স্বামী পরবর্তীতে) চালক হিসেবে নির্বচান করা হলো। এই সুইসাইডাল মিশনে আমি আর আজাদ হাফিজ নামলাম। সেপ্টেম্বর ২৪ শুক্রবার। আমার সাথে কোন অস্ত্র নাই একটা বেয়নেট আর ক্লোরোফর্ম ছাড়া। ধানমন্ডি এলকায় ঘুরঘুর করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। গাড়ি হাইজ্যাক করে আর্মস আনতে যেতে হবে হাতিরপুল। ওখানে আজিজ অপেক্ষা করছে। হাটখোলায় করিম অপেক্ষা করছে। পরে কোন উপায় না পেয়ে ঢাকা মেডিকেল গেলাম রিক্সায় করে। আমার বড়বোন লতিফা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে থাকে। সেই সাহসে ওখানে যাওয়া। সেখান থেকে সিনেমাটিক পন্থায় একটা গাড়ি হাইজ্যাক করলাম। আমরা টিএসসি দিয়ে নিউমার্কেটের দিক থেকে হাতিরপুল গেলাম। আমার গ্রুপের হাবিব আর সামসু আগে থেকে আজিজ ভাইয়ের ওখানে ছিল। আমরা আর্মস নিয়ে হাটখোলার দিকে রওনা দিলাম বারোটা নাগাদ। একটায় আমাদের আক্রমণ করার কথা। করিম ভাই পত্রিকা পড়ছে। মানে সেভ টু গো। আমরা ব্যাংকের সামনে গিয়ে পার্ক করলাম। আমরা চার জন। দেখলাম ব্যাংকের প্রধান ফটকের সাটার অফ। আমরা সাইডের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ম্যানেজারের রুমে ঢুকে গেলমান। একজন ক্যালকেশিয়ান লোক। তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিলাম। ভদ্র লোক আমাকে একবার দেখে বললেন, আপনার দেরি হয়ে গেছে। আরও আগে আসা উচিৎ ছিল আমি তো সব টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি স্টেট ব্যাংকে। কিন্তু আমি তার কথায় মজলাম না। বললাম ভল্টের চাবি কই। ভল্ট খোলেন। ভল্টের মধ্যে দেখি টাকা আর টাকা। এতো টাকা নিবো কি করে। পরে সিকিউরিটি গার্ডের মশারিতে করে টাকা নিলাম। পুরো টাকা নিতে পারলাম না। যা নিলাম সেটাও অনেক। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে এতোগুলো টাকা নিয়ে আমরা কলকাতা হয়ে আগরতলা পৌঁছাই। তখন ২ নং সেক্টরে ভীষণ অর্থ সংকট। এতোগুলো টাকা পেয়ে সবাই খুব খুশি হয়ে গেলেন। আমরাও পেলাম নতুন অস্ত্র।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ

ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ পরিকল্পনামূলক কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে ৮ জুলাই ২০২৩ সোমবার সকাল ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার কক্ষে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ পরিকল্পনামূলক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরীর নেটওয়ার্ক শিক্ষকগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. মাসুদুল আলম ভুইয়া, আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. জালাল উদ্দিন, আহমদ বাওয়ানী একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মো. ফরহাদ কবির সেলিম, কল্যাণপুর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ শামসুদ্দিন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মো. মনিরুল ইসলাম।

কর্মশালা সঞ্চালন করেন শিক্ষা ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও প্রকল্প পরিচালক মফিদুল হক কর্মশালায় উপস্থিত থেকে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগের ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম, রিচ আউট কর্মসূচি কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক শরীফ রেজা মাহমুদ এবং এসএম মোহসীন হেসেন।

কর্মশালায় জাদুঘরের পক্ষে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির বাংলা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট মোট ৫টি পাঠের ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণের জন্য প্রাথমিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত এবং জাদুঘরের আর্কাইভে সংরক্ষিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মারক, ডকুফিল্ম, ছবি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট পাঠের এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দকে সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডকুফিল্ম 'অনেক কথার একটি কথা', 'আমার দেশের লাগি' এবং 'তোলপাড়' প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণির বাংলা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করতে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণের আবশ্যকতা তুলে ধরেন এবং তা নির্মাণে তাদের পরিকল্পনা ও মতামত প্রদান করেন।

-এসএম মোহসীন হোসেন

১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকায় ট্রাস্টি আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে লিখেছিলেন–

Didn't we owe it to her for a long, long while?

-Aly Zaker

And weren't we sighing and shedding tears of expediency for over two decades? There were hundreds and thousands of us who were shell shocked in horror when the Pakistani marauders ...! Ah the word "marauders" and the word "pogrom" and "annihilation" and a host of such words that smell of the Swadhin Bangla Betar Kendra. Didn't we cry in despair when Dhaka was being battered and mauled and maimed on the night of the 25th and the morning of the 26th of March?

Didn't we frantically run around in a city just relieved of curfew to see if our dear and near ones were still living? Didn't we see in our minds eyes how our purpose for living was going to be controlled by the invader's mercy? We saw these and a lot more. It was then that we had decided to leave this dear city of ours and go wherever we could find the Bangladesh that Dhaka was even two nights before. What happened next is history.

This is the history I wanted my child to know. This is the history I wanted my posterity to be proud of. I desperately wanted to imbue him with the pride of an almost ethereal victory when he pronounced the words Joy Bangla. A battle cry that became the last uttered words before my brother was felled by an enemy bullet, my sister outraged. We saw history created by tears, sweat and blood of a whole nation was reversed totally, as if by the swinging of a wand. With flagrant disregard to the values and ideals of our glorious war of liberation, a game of palace intrigue, of dark conspiracies, of murder became the order of the day. The father of the nation was annihilated with almost all members of his family. Four national leaders arrested and put behind bars for hardly any believable reason were brutally murdered within the jail.

We were held hostage by volleys of blatant lies that suited the power that be. All these were possible because a credible source of information of the war of liberation was wanting. This was most terrifying for the generation next. Without a history and sense of direction they would grow up to be as Shakespeare put it," half made; sent to this world before their time." Would we then have to do with a pack of Zombies? This is what made me shudder in utter fear and dismay. I am grateful to my friends who had ignored the Pakistani bullets and fought an unequal war defiantly, for their decision to rope me in, into the Board of Trustees of Liberation Museum.

There is at least one place within the city of Dhaka today, where a living museum on the war of liberation of Bangladesh, has on display possibly he most genuine exhibits that no other museum can ever claim to have. This has been made possible by the most generous contribution of those who felt that the correct history of the nation has to be put on record. We owed it to our mother Bengal for a long, long time. By this very deed we have only endeavored to return only a part of our pledge to redeem our responsibility to our mother.

রোহিঙ্গাদের চোখে জীবন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাণোচ্ছলতা, শক্তি এবং ক্যাম্পে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। কোলাহলপূর্ণ সড়ক থেকে শুরু করে মহিমান্বিত পাহাড় যা ক্যাম্পগুলোর একটি শ্বাসরুদ্ধকর পটভূমি প্রদান করে। এই আলোকচিত্রগুলো রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রাণবন্ত চেতনাকে ধারণ করে।

প্রদর্শনীটি কিউরেট করেছেন ডেভিড পালাজন, সাহাত জিয়া হিরো, আমেনা খাতুন; প্রদর্শনীটির পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিয়ানমার অনুবিভাগের মহাপরিচালক মাঈনুল কবির বলেন, 'মানবিক কারণে মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিন্তু এখন তাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রয়োজন। বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। তা ছাড়া পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে। রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরগুলোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা বাড়ছে। অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সহায়তা ক্রমেই কমে আসছে'। এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের দ্রুত নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলাস বলেন, 'রোহিঙ্গাদের নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। আশ্রয়শিবিরে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত'।

স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি ইয়োহানেস ভন ডার ক্লাও বলেন, 'এই ছবিগুলো শরণার্থীদের দৃঢ়তা ও তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আশার প্রমাণ। আমরা আশা করি এই প্রদর্শনী শুধু রোহিঙ্গাদের সঙ্কটই নয়, তাদের অটল সাহস এবং এই সংকটের সমাধানের জরুরি প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করবে। তাদের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে টেকসই রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা। শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই দ্রুত প্রয়োজনীয় তহবিল বাড়াতে হবে'।

সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন, 'ইউএনএইচসিআর-এর সাথে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ

করছি। এই প্রদর্শনী মানুষকে শরণার্থীদের কাছ থেকে শরণার্থীদের জীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ দিচ্ছে, এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশান্তরী বাংলাদেশীদের স্মৃতিচারণের সুযোগ দিচ্ছে'।

প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি শিশির মোড়ল মুক্তিযুদ্ধকালে শরণার্থী হিসেবে ভারতের আশ্রয় শিবিরে থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সামিয়া তাবাসসুম, রোহিঙ্গা আলোকচিত্রী সাহাত জিয়া হিরো। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রোহিঙ্গা আলোকচিত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহাত জিয়া হিরো, শাহিদা উইন এবং মোহাম্মদ জোনায়েদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউএনএইচসিআর-এর বহিঃসম্পর্ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী আয়েশা খানম।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আগামীর আয়োজন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী তহবির গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে 'ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ' আগামী ২১ জুলাই ২১০২৩ শুক্রবার সকাল ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত হাতিরঝিলে একটি হাফ ম্যারাথন আয়োজন করেছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও আর টিভি প্রত্যক্ষভাবে এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যারা প্রতিটি রানারকে ৫০০০/- টাকা করে স্পন্সর করবে, শুধুমাত্র সেই অর্থই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী তহবিলে জমা হবে। ইতোমধ্যে তিন বিভাগে ১৫০০ রানার রেজিস্ট্রেশন করেছে। ম্যারাথনের জার্সি এবং মেডেল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

আমি কোনো কবি নই,
কবির মতো লিখতে পারি না,
তবে আমি এক অস্তিত্ব সচেতন মানুষ হতে চাই
জাদুঘর শুধু দেখার জন্য নয়,
অনুভব করার জায়গা

ইতি/ কোনো এক ভবিষ্যৎ

হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ভুলে যাওয়া অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির ঘটনা পুনরায় স্মরণ করে দেয়, বুকের ভেতরের পাজরগুলো ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে যায়। অনেক কষ্ট বুকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে চলছি সামনের দিকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ একটি আলাদা ভূখণ্ড, একটি আলাদা এবং একান্তই নিজস্ব একটি মানচিত্র। শত শত বার স্মরি তোমাদেরকে। বেঁচে থাকো আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

হেমু/২৩.০৬.২০২৩

কতখানি ত্যাগ ও সংগ্রাম পার হয়ে আজ আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। সেই ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের গভীরতা, দৃঢ়তা, ভালবাসা ঠিক কতটা গভীর আজ ছুটির দিনে হঠাৎ করেই এই জাদুঘরে ঘুরতে না আসলে নতুন করে উপলব্ধি করা হতো না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, তাঁদের আত্মত্যাগের কথা প্রতিবার নতুন করে স্মরণ করতে হবে। আমাদের উত্তরসুরীদের জানাতে হবে। হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

ইশরাত জাহান তিথি/২৩.০৬.২০২৩

যে জাতি তার শিকড়কে ভুলে যায় তার নিজের বলে কিছুই থাকে না। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে মাতামাতি করি ইংল্যান্ডের অর্ধপৃথিবী শাসন করা নিয়ে একের পর এক থিসিস করি। লেখাপড়া করি পারস্য, স্পেন, পর্তুগীজদের সারা বিশ্বে অভিযান, পড়ি সেই সুদীর্ঘকালের ট্রয় নগরীর যুদ্ধ, হেক্টরন ও এলিকিসির বীরত্বগাথা। কিন্তু ওই রকম কত শত শত বীর আমাদের দেশেই ছিলো যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আরও আছে শত শত না লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের আত্মত্যাগ, তার খবর কে রাখি? ইতিহাসের চর্চা ও প্রদর্শন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয়তো সময়ে সবকিছুই বিকৃত হয়ে যাবে। নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে না। তাদের এই স্বাধীনতার জন্য একটা সময় মানুষ ঠিক কতটাই আত্মত্যাগ করেছিল।

শুভ্র/০৩.০৭.২০২৩

মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস আমার অজানা ছিল। শুধু সেটুকুই জানতে পেরেছিলাম যেটুকু বইয়ে পড়েছি। নারী নির্যাতন ও গণহত্যার দৃশ্যগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তাদের এবং শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। জয় বাংলাদেশ।

কনক প্রভা দে, মুন্সীগঞ্জ

আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে মুগ্ধ হয়েছি অনেক প্রাচীন স্থানের জিনিস দেখে বিমোহিত হয়েছি।

মুনিফ মাহদি

রামচন্দ্র বহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ম শ্রেণি, ঈশ্বরদী, পাবনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান দিলেন যারা

১৫ জুন থেকে ১০ জুলাই ২০২৩

সাধারণ সদস্য	: Amari Arundhati Ali	২৫,০০০/-
	Darian Ashwin Ali	২৫,০০০/-
	Ishaan Anirban Karim	২৫,০০০/-
	Abyan Nikhil Karim	২৫,০০০/-
	Mr. Masood Ali	৫০,০০০/-
আজীবন সদস্য	: Dhyanesh Yasser Ali	১,০০,০০০/-
	Srabonti Narmeen Ali	১,০০,০০০/-
	Milia Shamshad Ali	১,০০,০০০/-
	Adnan Ataul Karim	১,০০,০০০/-
	Namira Hossain	১,০০,০০০/-
উদ্যোক্ত সদস্য	: সুভাষ চন্দ্র ঘোষ	৫,০০,০০০/-
	বাদল চন্দ্র রায় (জড়োয়া হাউস)	৫,০০,০০০/-

বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

৭ জুলাই ২০২৩ বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদুত IWAMA Kiminor মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official